রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজী

স্বামী বলভদ্রানন্দ

আমরা যাকে সাধারণভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বলি, আইনগত দিক থেকে তা দুটি সংস্থা—রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজীর ভাষায় : ''মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নাই। কেবল আইন বজায় রাখিবার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিতর একটি নামমাত্র পার্থক্য রাখা হইতেছে। রাহু ও তাহার শির প্রকৃতপক্ষে একবস্তু হইলেও কেবল বাক্যবিন্যাসের ফলে যেমন একটি কাল্পনিক পার্থক্যের ভাব আমাদের মনে আনয়ন করে...।''[১]

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। সর্বধর্মমতে সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সিদ্ধ হলেন, ষোড়শীপূজাটিও হয়ে গেল, তখনই কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে তিনি যুগাবতার, তাঁর সাধনভজন পরার্থে। তাঁর মুক্তি নেই; কারণ ধর্মগ্লানি দূর করার জন্য তাঁকে যুগে যুগে 'সম্ভব' হতে হবে। তিনি উপলব্ধি করলেন : ''ইচ্ছাময়ী জগদম্বা... তাঁহার ভিতর যে মহদুদার আধ্যাত্মিক ভাবের অবতারণা করাইয়াছেন তাহা ইতঃপূর্বে জগতে অন্য কোন আচার্য মহাপুরুষকেই আর করেন নাই।''[২] শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখলেন, ''বাহিরে চতুর্দিকে ধর্মাভাব আর (তাঁর নিজের) ভিতরে মার লীলায় ঐ অভাবপূরণের জন্য অদৃষ্টপূর্ব শক্তি-সঞ্চয়!''[৩] 'এবং ঐ শক্তি অপরে সংক্রমণের জন্য' মা তাঁকে 'অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন।' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সেই অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণ-যন্ত্রের ক্রিয়াশীল রূপ, যার কাজ জগৎ জুড়ে আধ্যাত্মিকতার 'সংক্রমণ', যে-আধ্যাত্মিকতা একইসঙ্গে মহৎ ও উদার, স্বামীজীর ভাষায় সমুদ্রের মতো গভীর ও আকাশের মতো ব্যাপক, যে-পরিমাণের ও প্রকৃতির আধ্যাত্মিকতা জগন্মাতা এর আগে আর কখনই কোনও ব্যক্তির মধ্যে পরিস্ফুট করেননি। এই অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিরই প্রবহমান রূপ এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

সব সাধনার শেষে নিজেকে অবতার-রূপে চেনা এবং আরও কয়েকটি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই সঙ্ঘ-সংক্রান্ত একটি উপলব্ধিও হয়েছিল : ''শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে।''[৪] একইসঙ্গে ''কোন্ ভাগ্যবানেরা তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে অবস্থিত সাক্ষাৎ মার নিকট হইতে ঐ নবীনোদার ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ

জীবনগঠনে ধন্য হইবে, কাহারা মার নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্তমান যুগের অভিনব লীলার সহায়ক হইয়া অপরকে ঐ ভাব গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করিবে, কাহাদিগকে মা ঐ মহৎ কার্যানুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন—এই সকল কথা বুঝিবার, জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার মন এ সময় ব্যাকুল হইয়া উঠে।"[৫] মা তাঁর এই ইচ্ছাও পূরণ করলেন; কারা তাঁর কাজের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে আসবেন ও ওই নবীন সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ হবেন, তাঁদের মুখচ্ছবিও জগজ্জননী এইসময় তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। এরপর থেকেই ঠাকুর নিত্য কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে তাঁর চিহ্নিত পার্ষদদের জন্য ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছেন : ''তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে।" ভবতারিণীর দর্শনের জন্য তাঁর যে-কান্না, তার থেকে এ-কান্না কম আকুল ছিল না। ঠাকুরের নিজের ভাষায় : ''মনে হতো পাগল হয়ে যাব।... কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই! আর আগে দেখেছিলাম বলে তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম! তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বললে, 'ঐ পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হলো।'... মা দেখিয়ে বলে দিলে, এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।"[৬]

ঠাকুরের কাছে যখন তাঁর চিহ্নিত পার্ষদরা আসতে শুরু করলেন, ঠাকুর তাঁদের অদৃষ্টপূর্ব ভালবাসায় বেঁধে ফেললেন। একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতির কলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ইচ্ছে হচ্ছে : ''ভকত-কুসুম যত আনিলে আপন সাথ,/ নন্দন-কাননের সুন্দর পারিজাত।" নন্দন-কাননের পারিজাত ফুলসম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা ঠাকুরের অমোঘ ভালবাসায় সঙ্ঘ-মালিকায় গ্রথিত হতে শুরু করেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অদৃশ্য সূচনা তখনই, দক্ষিণেশ্বরেই। এখানেই নরেন্দ্রনাথের অনায়াস স্বাভাবিক প্রকাশ ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের নেতারূপে। প্রতিভায়, ভালবাসায়, নিঃস্বার্থতায়, ঈশ্বরপরায়ণতায়, ত্যাগে তিনি সবার উপরে, আবার নিজগুণেই সকলের প্রাণের কাছের শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই—এভাবেই নিজগুণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ পরিচর্যায় ভাবী সঙ্ঘের নেতারূপে ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন নরেন্দ্র।

অপরদিকে নেপথ্যে, নহবতের ঘেরাটোপে, অলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছিলেন ভবিষ্যৎ সঙ্ঘজননীও। মা শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের তাঁর নিজের সন্তানরূপে মনে মনে বরণ করে নিয়েছেন তখনই—যদিও মাতৃপ্রতিমা তখনও দৃশ্যমান নন সন্তানদের কাছে। কিন্তু জননীর স্নেহের প্রকাশ দৃশ্যমান, স্নেহপ্রসূত সেবা দৃশ্যমান। তাই সারদাপ্রসন্ন তাঁর বাড়ি ফেরার পয়সাটি প্রতিদিন রক্ষিত দেখেন নহবতের দ্বারে। নরেন এসে যখনই দক্ষিণেশ্বরে থাকতে রাজি হন ঠাকুরের কথায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় ঘন ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটিও প্রস্তুত হতে থাকে নহবতে। রাখালের নবপরিণীতা স্ত্রী নহবতে পুত্রবধূরূপে সাদরে গৃহীত হন নিজের শ্বশুরবাড়ির মতোই—টাকা দিয়ে মা তাঁর মুখ দেখেন, ঠিক যেভাবে সব পরিবারে নববধূকে বরণ করা হয়।

আরও কিছুদিন পরে মা আরও দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সঙ্ঘজননীত্বের এলাকায়। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন : সাধন-ভজনের বিঘ্ন হবে বলে ত্যাগী-সন্তানদের রাতের আহারে ঠাকুর যে-ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছেন, তা তিনি মেনে চলতে পারবেন না। তিনি তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী সন্তানদেরও রাতে পেটভরে খাওয়াবেন। মা ঠিক যে-কথাটি ঠাকুরকে এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা হল : ''তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" অর্থাৎ রাতে বেশি খাওয়ার জন্য যদি ত্যাগী-সন্তানদের আধ্যাত্মিক সাধনায় বিঘ্ন হয়, তবে সেই বিঘ্ন তিনিই দূর করে দেবেন।

এইভাবে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের আগমনের সঙ্গে

সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবী সঙ্ঘ গড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তখন জগন্মাতার প্রসাদে জেনে গেছেন, এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই তাঁর জীবনব্রত জগৎকল্যাণে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর স্থূলদেহটির অবসানের পরেও এই সঙ্ঘই 'তিনি' হয়ে তাঁর যুগধর্মস্থাপনের কাজ করে চলবে বহু শতাব্দী ধরে।

অনেকের ধারণা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যে গিয়ে খ্রিস্টীয় চার্চ ও অন্যান্য সঙ্ঘ দেখে তিনি সঙ্ঘের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়েছেন এবং সেজন্য ভারতে এসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১ মে ১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাসভায় স্বামীজীও বলেছিলেন : ''নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।''[৭] কিন্তু আমরা দেখলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকেই জগন্মাতার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সেই সঙ্ঘের গঠনকাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। বস্তুত দক্ষিণেশ্বরে ও শ্যামপুকুর-কাশীপুরে ঠাকুরের শেষশয্যার চারপাশে আমরা ভাবী সঙ্ঘের ভ্রূণাবস্থা দেখেছি এবং ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরানগর, আলমবাজার ও নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া মঠবাড়িতে দেখেছি সঙ্ঘের নবজাতক ও কৈশোর রূপ। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, কাশীপুরে শেষ অসুখের সময় ঠাকুর বারবার বলতেন, ''আহা, ওদের (ত্যাগী সন্তানদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!''[৮] দেহত্যাগের আগে দেখা যেত নরেন্দ্রকে মাঝেমাঝেই তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন এবং অন্যদের বের হয়ে যেতে বলে নিভৃতে দু-তিন ঘণ্টা কথা বলে 'ভবিষ্যৎ কর্মাদি সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন।' আমরা অনুমান করতে পারি, এই আলোচনার মধ্যে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ সম্বন্ধেও নির্দেশ থাকত। শেষে লীলাবসানের দুদিন আগে নরেন্দ্রকে তিনি অন্য শিষ্যদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ''দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।''[৯]

এই কারণেই আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছুদিন পরে যখন বলরাম বসু ও সুরেন মিত্র অল্পদিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেন, তখন গুরুভাইদের বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীজী হন্যে হয়ে কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে ২৬ মে ১৮৯০ তারিখে লিখেছিলেন : ''আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব,... তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।'' রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম্পরাগত মত সেজন্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণই এই সঙ্ঘের ধারণাটি—তিনি যেমন তাঁর সব কাজই মায়ের ইচ্ছায় হচ্ছে বলে মনে করতেন—জগজ্জননীর প্রসাদে প্রথম ভেবেছেন বা conceive করেছেন এবং তিনিই একে বীজাকারে সংগঠন করেছেন। ১৮৮৬-র জানুয়ারি মাসে অদ্বৈতানন্দজী (তখন বুড়োগোপালদা) গঙ্গাসাগর তীর্থে আগত সন্ন্যাসীদের গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দেওয়া মনস্থ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, কাশীপুরে সমবেত ত্যাগী ভক্তদের চেয়ে উচ্চস্তরের সাধুর অন্বেষণ বৃথা, তাঁদের ওইসব জিনিস দিলেই যথেষ্ট পুণ্যলাভ হবে। সেই অনুযায়ী বুড়ো-গোপালদার আনা গেরুয়াবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুর স্বহস্তে অর্পণ করেছিলেন কাশীপুরে উপস্থিত এগারো জন ভাবী সন্ন্যাসী পার্ষদের হাতে : নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়োগোপাল। তারিখটি ছিল

১৮৮৬-র ১২ জানুয়ারি। এ-প্রসঙ্গে গম্ভীরানন্দজীর মন্তব্য : ''শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইহাই আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বলিতে পারা যায়।'' তবে স্বামীজী যে ১ মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করার প্রাঙ্মুহূর্তে বলেছিলেন, ''নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না'', তার তাৎপর্য হল : শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে-সঙ্ঘভাবনা গেঁথে দিয়েছিলেন, তার উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় পাশ্চাত্য দেশে সঙ্ঘভিত্তিক কাজের ইতিবাচক বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে। একবার লেডি মিন্টো বেলুড় মঠ দেখতে এসে স্বামী শিবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : ''আচ্ছা, এসব তো স্বামী বিবেকানন্দই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?'' শিবানন্দজী উত্তর দেন : ''না, এ-সঙ্ঘ আমরা করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় তিনিই এই সঙ্ঘ সৃষ্টি করে গেছেন।'' স্বামী ভূতেশানন্দজীর অনুরূপ বক্তব্য পাই তাঁর 'The Ramakrishna-Vivekananda Movement' প্রবন্ধে : ''Sri Ramakrishna started the organisation, which is non-sectarian and expanding''।[১০]

এসব বলে কি আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামীজীর ভূমিকাকে খর্ব বা অস্বীকার করছি? তা নয়। স্বামীজীর মহান ও অনন্য ভূমিকা এইখানে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্ঘকে বাস্তব রূপ দেওয়ার দায়িত্ব যেমন স্বামীজীকে দিয়েছিলেন, তেমনই এই সঙ্ঘ কীরকম হবে—এর অন্তরঙ্গ আদর্শ ও তা রূপায়ণের বহিরঙ্গ বাস্তব রূপ—উভয়ই তিনি একমাত্র স্বামীজীর কাছেই প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর অসাধারণ ধারণাশক্তি, কর্মশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির সাহায্যে সেই সঙ্ঘকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু করেন ১৮৯৭-র ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ স্বামীজীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে এই সঙ্ঘকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-মুখে পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য বলে গেছেন : ''আমরা ছাঁচ করে দিয়ে গেলাম, তোরা শুধু দাগা বুলিয়ে যা।''

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিষয়ক আলোচনায় মায়ের ভূমিকাটির প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন না করে অগ্রসর হলে আলোচনাটি অপূর্ণ ও দুষ্ট থেকে যায়। মনে রাখতে হবে, যে-দুটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্ঘ নির্মাণ করেছিলেন তার একটি স্বামীজী, অপরটি শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি মূল ভাবগুলি স্বামীজীই সর্বাপেক্ষা সঠিকভাবে বুঝতেন—এ-সত্য তাঁর গুরুভাইয়েরাও বারবার উপলব্ধি করেছেন। স্বামীজী নিজেও বলেছেন : ''...he lived that great life,—and I read the meaning''[১১]—তিনি সেই মহান জীবনটি যাপন করে গেছেন এবং আমিই সেই জীবনের অর্থ-উদ্ধার করেছি। স্বীয় জীবনের যথার্থ অর্থপাঠের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমাধিলোক থেকে ব্যুত্থিত করে নিয়ে এসেছিলেন, সেজন্যই একদিন সকলের সামনে নরেনকে ইঙ্গিত করে সহর্ষে বলেছিলেন : ''...ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো!''[১২] সেজন্যই স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দকে যাত্রার প্রাক্‌কালে শুভাশীর্বাদ করে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম... দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।''[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-হীন পর্বে সঙ্ঘজননী নরেন্দ্রনাথকে 'সর্বস্ব' বলে চিনেছেন কারণ যে-রত্নসিন্দুক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণপাত সাধনা করে জগতের মানুষের জন্য পুনরুদ্ধার করেছেন, তা তিনি নরেন্দ্রের কাছেই গচ্ছিত রেখে গেছেন জগৎকল্যাণে বিতরণের জন্য। আর শ্রীমা স্বয়ং তো শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের হাতে গড়া তাঁর বিশ্বপ্রেম ধারণের অমৃতভাণ্ড—নিবেদিতা যেকথা বলেছেন তাঁর অতুলনীয় শব্দবিন্যাসে : ''Sri Ramakrishna's own chalice of his love for

this world"। তাই, নরেনের মতো মায়ের উপরেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভার দিয়ে গেছেন তাঁর আরব্ধ জীবনব্রত পালনের; বলেছেন, মাকে তাঁর নিজের থেকেও ঢের বেশি করতে হবে। কলকাতা তথা আধুনিক পৃথিবীর মানুষ যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে; মাকে তাদের দেখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের অসমাপ্ত কাজ হিসেবে। ঠাকুর মাকে মন্দিরের ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্না দেখেছেন, ষোড়শী দেবীজ্ঞানে পূজা করেছেন, বলেছেন, ''সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" কাজেই, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীমায়ের ভূমিকা কী, এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্তের দৃষ্টিতে একথা আমরা বলতেই পারি যে, আদ্যাশক্তিরূপে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের 'স্বপ্রয়োজনা-ভাবে অপি ভূতানুজিঘৃক্ষু' মানসে[১৪] সঙ্ঘ-কল্পনা জাগিয়েছেন, এবং তিনিই আবার যুগাবতারের মানবী দেহধারিণী লীলাসঙ্গিনীরূপে এই সঙ্ঘের সর্বাঙ্গীণ পরিপোষক ও পরিপালকরূপে বিরাজ করেছেন। স্বামীজীর ভাষায় ''তিনি আমাদের সঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"[১৫] স্বামীজী ছাড়া একমাত্র শ্রীশ্রীমাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের একটা যুগান্তকারী তাৎপর্য আছে এবং তিনি স্থূলদেহ ছেড়ে চলে গেছেন বলেই সব শেষ হয়ে গেল না। একটি নতুন ধারার সঙ্ঘ গড়ে উঠবে, যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সক্রিয় থাকবে ও জগতের কল্যাণ করে চলবে। স্বামীজী যখন পাগলের মতো একটি স্থায়ী আস্তানা ও সুস্থির অর্থসংস্থানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন সঙ্ঘের জন্য, মাও তখন ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে চলেছেন সঙ্ঘের জন্য। সেই কারণে পরবর্তী কালে স্বামী সারদেশানন্দজীকে যোগীন মা বলেছিলেন, ''যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।' মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"[১৬] তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন ১৮৮৬-র ১৬ আগস্ট। তার আগেই তিনি তাঁর প্রেমের বাঁধনে গ্রথিত স্ফুটমান সঙ্ঘের মানবসম্পদ ও সে-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা—উভয়ই তুলে দিয়েছেন প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ—ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দের প্রশস্ত স্কন্ধে। ১৮৮৬-র অক্টোবর মাসে বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। এই হল প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ, যে-মঠ ১৮৯১-র নভেম্বর মাসে চলে যাবে আলমবাজারে, তার ছ-সাত বছর পর নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে এবং ১৮৯৯ থেকে বেলুড় মঠে। এই বরানগর মঠ থেকে কয়েক দফায় স্বামীজী পরিব্রাজক সন্ন্যাসিরূপে ভারত-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। শেষবার বেরিয়েছিলেন ১৮৯১-র এপ্রিলে, ফিরেছিলেন ১৮৯৭-র ফেব্রুয়ারিতে, তাঁর পাশ্চাত্যকীর্তির পরে—যখন মঠ স্থানান্তরিত হয়ে গেছে আলমবাজারে।

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা আসলে ভারতকে আবিষ্কার। পরবর্তী কালে স্বামীজী ভারত সম্পর্কে যা বলেছেন, সবই এই সময়কার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই প্রত্যক্ষ ভারতদর্শন না হলে, যে-বিবেকানন্দকে ভারত ও জগতের প্রয়োজন ছিল তার নির্মাণ সম্পূর্ণ হত না। ভারতের শক্তি ও দুর্বলতা, গৌরব ও লজ্জা, সমস্যা ও সম্ভাবনা—সবই তিনি আবিষ্কার করলেন এই ভারত-পরিক্রমাকালে। তিনি আবিষ্কার করলেন : ভারতের প্রাণ হল ধর্ম, ভারতের শক্তি তার ধর্মপ্রাণ সাধারণ নরনারী—যারা দরিদ্র কিন্তু সৎ, অশিক্ষিত কিন্তু বড় মনের অধিকারী, যারা সরল, সচ্চরিত্র, অতিথিবৎসল। আর দুর্বলতা? তার তালিকাও কম নয়। মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধনী ও উচ্চবর্ণের

হৃদয়হীনতায় তাদের দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়ে চলা প্রভৃতি। আরও একটি নিদারুণ অন্যায় তাঁর চোখে পড়ল। ঘরে ঘরে শান্তিরূপে, শক্তিরূপে, পালিকা ও পোষিকারূপে যে-নারীর অপরিহার্য উপস্থিতি, জাতির ব্যাপক বাহ্যিক জীবনে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। অথচ পাখির দুটি ডানার একটি ডানার মতো জাতির জীবনে তারা অতি আবশ্যিক অর্ধাঙ্গ।

পরবর্তী কালে স্বামীজী বলবেন : বহু শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হয়েছে, শেখানো হয়েছে তারা কিছুই নয়। সাধারণ মানুষকে চিরকাল বলা হয়েছে—তোমরা মানুষ নও।... ক্রমশ তারা সত্যিসত্যিই পশুস্তরে নেমে গেছে। স্বামীজী আরও বলবেন : জনগণ আর নারীজাতিকে অবহেলা—এ-দুটিই ভারতের জাতীয় মহাপাপ। আমাদের উন্নতিও করতে হবে ওই দুটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ভারতের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্বলতাগুলি যখনই তাঁর সহজাত বুদ্ধহৃদয়কে ব্যথিত করেছে, তখনই তিনি সেগুলির সমাধান খুঁজেছেন গুরুদেবের জীবন ও বাণীর মধ্যে। গুরুদেব বলে গেছেন : ''খালি পেটে ধর্ম হয় না'', ''শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'', ''অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর''। কাশী যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈদ্যনাথ ধামে নিরন্ন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের মধ্যেই বসে পড়েছিলেন, বলেছিলেন কাশী তিনি যাবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, বিরাট বটগাছের মতো হতে হবে তাঁকে, চোখ খুলে সবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে হবে, শুধু চোখ বুজে ধ্যানের গভীরে নয়। আরও বলেছিলেন যে তাঁকে 'মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবন' ঘটাতে হবে—যেকথা তিনি একমাত্র বলেছিলেন শিষ্য শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (পরবর্তী কালে স্বামী সদানন্দকে), পরিব্রাজকজীবনে হাতরাস স্টেশনে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাই দেখি, ভারতের দুঃখ-দুর্দশা দেখে স্বামীজী তাতে involved হয়ে গিয়েছিলেন, মনের মধ্যে বর্ম তুলে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। গুরুনির্দিষ্ট কর্তব্যবোধই তাঁকে তা করতে দেয়নি। অবশেষে কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের শেষ শিলাখণ্ডে বসে ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই ধ্যান করলেন তিনি। ভারতের অতীত গৌরব, বর্তমানের অধঃপতিত রূপ, ভবিষ্যতের অধিকতর গৌরবময় রূপ—সব পরপর তাঁর ধ্যাননেত্রে ভেসে উঠল। কীভাবে পৌঁছতে হবে বর্তমানের অন্ধকার থেকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর পর্যায়ে—তাও তিনি জানতে পারলেন। যে-সনাতন ধর্মের শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অতীতের সম্পদ ছিল তার পুনঃ আচরণের মধ্যেই রয়েছে ভারতের পুনরুজ্জীবনের নিদান, তবে তার জন্য সনাতন ধর্মের যুগোপযোগী প্রয়োগ ঘটাতে হবে মানুষের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে।

স্বামীজীর পরবর্তী কালের চিঠি প্রমাণ করে, পরিব্রাজকজীবনে ভারতের দুঃখ দুর্দশা যখন তাঁকে এইভাবে বিচলিত করেছিল, তখন তাঁর মনে পড়েছিল মঠের ত্যাগী গুরুভাইদের কথা—তাঁদের কি ব্যবহার করা যায় ভারতের ভাগ্য ফেরাতে? কিন্তু তখনও বাকি আছে তাঁর বহির্বিশ্ব দেখতে। তিনি জানেন না তখনও, কিন্তু গুরুদেব জানতেন, ভারতের বাইরের জগতও তাঁকে দেখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রত পালনের জন্য। তাই তিনি একটি চিরকুটে তাঁর আদেশপত্রে লিখে দিয়েছিলেন : ''নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।'' ভারত 'ঘুরে' 'বাহিরে', কিংবা ঘরে ও বাইরে—যাই হোক না কেন সেই আদেশপত্রের অর্থ, সামগ্রিক তাৎপর্য একই; নরেনকে ভারতসহ গোটা বিশ্ববাসীকে লোকশিক্ষা দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন এবং তা-ই তাঁর অভিপ্রেত। চেতনানন্দজী তাঁর 'Vivekananda on the Way to Chicago' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন :

রাতের পর রাত ঠাকুর এসে স্বামীজীকে বুঝিয়েছেন, ধর্মমহাসভায় যেতে। এও বলেছেন, ''আমি তোর জন্যই সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওরা সব তোর কথা শুনে মুগ্ধ (amazed) হয়ে যাবে।''[১৭] ঠাকুরের (এবং শ্রীমারও) স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েই স্বামীজী পাশ্চাত্যে যেতে সম্মত হয়েছিলেন।

তারপরের ঘটনা সর্বজনজ্ঞাত ইতিহাস। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর উপস্থিত হওয়ার অর্থ : শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মগ্রহিষ্ণুতার বাণী এই প্রথম জগতের সামনে পরিবেশিত হল। অবতার তো সারা জগতের। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখ থেকে যুগাবতার সারা জগতের হতে শুরু করলেন। স্বামীজী দেখলেন : যে-অমৃতের ভাণ্ডার শ্রীরামকৃষ্ণ, নিজের সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, প্রাণপাতী সাধন-ভজনের দ্বারা আবিষ্কার করেছেন, যা ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক মহাসাগর থেকেই সম্ভূত, যে-অমৃতের ভাণ্ডার গুরুদেব তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন উপযুক্ত সময়ে নির্বিচার বিতরণের জন্য—পাশ্চাত্যবাসী ও বিশ্ববাসী নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেই অমৃতভাণ্ডারের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। স্বামীজী ভারতে ফিরে এসে বলেছিলেন : ''তোমরা বিন্দুমাত্রও জান না, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য ভারতবর্ষের বাইরের মানুষের মনে কতখানি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জমাট বেঁধে রয়েছে।''[১৮]

পাশ্চাত্যে স্বামীজী চমৎকৃত হলেন মানুষের আত্মপ্রত্যয়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা দেখে। বিশেষত মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘরে-বাইরে পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে কাজ করছে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য থেকে আলমবাজার মঠে গুরুভাইদের কাছে তিনি যে-প্রথম চিঠিটি লেখেন, তাতে তিনি আমেরিকার মেয়েদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন : ''এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর।... এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র।''[১৯] কী কারণে ভারতের নারী-পুরুষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের এই পার্থক্য? স্বামীজী উত্তর পেলেন : শিক্ষা। ''ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।'' ''সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই।''

ভারত-পরিক্রমা কালে ভারতের সমস্যাগুলিকে তিনি অনুভব ও চিহ্নিত করেছিলেন, ধর্মভিত্তিক কর্মপদ্ধতিই তার সমাধান তাও উপলব্ধি করেছিলেন কন্যাকুমারীতেই—কিন্তু কী হবে সেই কর্মে পরিণত সমাধান-পদ্ধতি তা তিনি বুঝতে পারলেন পাশ্চাত্যে এসেই। ভারতের জাগরণের পথটি এইসময় থেকে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল—যদিও তিনি সবসময় সচেতন ছিলেন যে, দুটি দেশের জাতীয় প্রকৃতি আলাদা। তিনি বুঝলেন : স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। হিন্দুরা ধর্মে স্বাধীনতা দিয়েছে, সমাজে দেয়নি। তাই হিন্দুর ধর্ম মহান, সমাজ সংকুচিত। পাশ্চাত্যে সমাজে স্বাধীনতা, ধর্মে স্বাধীনতার অভাব। তাই পাশ্চাত্যে সমাজ উন্নত, ধর্ম অপরিণত। স্বামীজী ভারতের ধর্মকে একইরকম স্বাধীন রেখে ভারতীয় সমাজকে স্বাধীনতা দিতে চাইলেন; ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করে ভারতের নারী ও জনসাধারণকে দারিদ্র্যমুক্ত ও শিক্ষিত করতে চাইলেন। এরই ভিত্তিতে তিনি ধর্মমহাসভার পরে

পাশ্চাত্যে বসেই, প্রধানত দক্ষিণ ভারতের শিষ্য ও অনুরাগীদের অনুপ্রাণিত করে, তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের যে-কাজটি দিয়েছিলেন তার সূচনা করেছিলেন। সেইজন্য অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে ধর্মমহাসভা পরবর্তী একটি অধ্যায়ের নামই হল 'Setting the Indian Work in Motion'।

স্বামীজী কখনই ভাবতে পারেননি যে, দেশে যে-শিশু সন্ন্যাসিসঙ্ঘটিকে তিনি রেখে এসেছেন, তার কাজ তাঁর ভারত গড়ার কাজের থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকবে। বরং এই সঙ্ঘই হবে ভারত-জাগরণের হৃদয়। ধর্মমহাসভার তিন মাস পরে ১৮৯৪-এর জানুয়ারিতে লেখা একটি চিঠিতে তিনি প্রথম রামকৃষ্ণানন্দজীকে সম্বোধন করে সঙ্ঘের গুরুভাইদের কাছে তাঁর কর্ম-পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীর প্রথম খণ্ডের পূর্বোক্ত অধ্যায়টি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি, লেখকের নিজস্ব বঙ্গানুবাদে : ''তিনি যেন (দক্ষিণ ভারতের শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে লেখা চিঠিগুলির তুলনায়) আরও অনেক বেশি শক্তি, অনেক বেশি উদ্দীপনার আগুন ঢেলে দিলেন মঠে গুরুভাইদের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী, তাঁর ত্যাগী গুরুভাইয়েরা—তাঁরাই তো হবেন তাঁর ভারতীয় কার্যের, এবং অবশ্যই তাঁর বিশ্বব্যাপী জীবনব্রতের হৃদয়স্বরূপ। তাঁদের কাছেই তিনি সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা চাইলেন। তাঁদের কাছেই তিনি প্রকাশ করলেন দেশকে নিয়ে তাঁর হৃদয়-যন্ত্রণা এবং আশার কথা। তাঁদের কাছেই তিনি খুঁটিনাটি সহ লিখলেন তাঁর ভারতবর্ষীয় কার্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে, সংগঠন সম্বন্ধে; ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্ঘের কী স্থান সে-সম্বন্ধে। এই চিঠির সবটুকুই মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে এল আশ্চর্যজনক সংবাদের মতো। কারণ, তাঁদের নরেন তাঁর এই স্বপ্ন ও পরিকল্পনাগুলির কথা—আগে কখনই তাঁদের কাছে প্রায় বলেনইনি, এত খুঁটিনাটি সহ তো নয়ই।... তিনি যে ভারতীয় সন্ন্যাসমার্গকে একটি নতুন রূপ, নতুন উদ্দেশ্য ও নতুন তাৎপর্য দিতে চলেছেন, নেতারূপে সেই মনোভাবও তিনি আগে কখনও তাঁদের কাছে প্রকাশ করেননি।''[২০]

রামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠি থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি। ভারত-পরিক্রমাকালে দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য স্বামীজীকে কতটা পীড়িত করেছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাব : ''যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!... দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা...। মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদির সহায়ে—আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না।... এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০।১৫ জন লোক

পাব।... ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!!... তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life."

হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা ২০ জুন ১৮৯৪ তারিখের চিঠিতেও স্বামীজী ভারতবর্ষের কাজের জন্য অনুরূপ পরিকল্পনার কথা লিখেছেন। তারপর নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তার উত্তর দিয়েছেন : ''এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্ন্যাসিগণ কিসের জন্য এ-জাতীয় ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর হইবে? উত্তরে আমি বলিব—ধর্মের প্রেরণায়। প্রত্যেক নূতন ধর্ম-তরঙ্গেরই একটি নূতন কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রাচীন ধর্ম শুধু নূতন কেন্দ্র-সহায়েই নূতনভাবে সঞ্জীবিত হইতে পারে।... সেই শক্তিকেন্দ্র—সেই পথপ্রদর্শক দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি সেই মহান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুবকদল ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহারাই এ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবে।"

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসিসঙ্ঘের নবীন সেবাময় রূপটি এইসময় ক্রমশই স্বামীজীর অনুধ্যানে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এইসময় থেকেই গঙ্গার পূর্বদিকে একটি স্ত্রীমঠ স্থাপনের ইচ্ছাও তিনি পোষণ করতে থাকেন এবং ছেলেদের মঠেরও আগে 'মা ও মায়ের মেয়েদের' ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ব্যস্ত হতে থাকেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে ১৮৯৫ সালে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে তিনি আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে লিখেছিলেন : ''জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু' গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবসাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর-ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।"

স্বামীজীর এইসময়ের চিন্তাগুলি সম্বন্ধে সিস্টার ক্রিস্টিন লিখেছেন, ''In those early days we did not know the thoughts that were seething in Swamiji's mind day and night. 'The work! the work!', he cried. 'How to begin the work in India! The way, the means!' " যে-সময়ের কথা ক্রিস্টিন বলছেন সেটি ১৮৯৪-৯৫ হবে; কারণ ওই স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে গ্রিনএকার ও থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের উল্লেখ আছে, যে-দুটি জায়গায় স্বামীজী ছিলেন যথাক্রমে ১৮৯৪ ও ১৮৯৫-এর গ্রীষ্মে।

সিস্টার ক্রিস্টিন বলছেন, সেইসময় সর্বক্ষণ স্বামীজীকে অধিকার করে থাকত এই একটি চিন্তা : '' 'কীভাবে ভারতে কাজ শুরু করা যায়! পথ কী? পদ্ধতি কী?' তারপর, কী রূপ নেবে ভারতবর্ষের কাজ, ধীরে ধীরে তার ছবি তাঁর মধ্যে তৈরি হয়ে উঠল। এবং অবশ্যই তাঁর আমেরিকা ত্যাগের আগে তাঁর ভারতবর্ষীয় কাজের পথ-পদ্ধতি-উপায়—তাঁর কাছে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন উপলব্ধি করেছিলেন, টাকা কোনও প্রতিকার নয়, এমনকী সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা-ও নয়। দরকার অন্য এক ধরনের শিক্ষা, তা হল : প্রতিটি মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করুক, দেবত্বকে উপলব্ধি করুক। এ যেন মানুষের জীবন্ত উপলব্ধি হয়ে ওঠে, তাহলে আর সবকিছু এর পিছু পিছু আসবে—ক্ষমতা, শক্তি, মনুষ্যত্ব সবকিছু।... ভারতে ফিরে এই বাণীই তিনি ঘোষণা করলেন কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত।"

স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন : তাঁর মিশন বা জীবনব্রত হল প্রতিটি মানুষকে তার দৈবী-স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শিখিয়ে দেওয়া—

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সেই দেবত্বকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। স্বামীজী ঠাকুরেরই দেহহীন কণ্ঠস্বর। ঠাকুরের 'মিশন'ই স্বামীজীর 'মিশন'। ঠাকুর যে কল্পতরু হয়ে নির্বিচারে জগদ্‌বাসীকে আশীর্বাদ করেছেন 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে, তার তাৎপর্যও তো এই : প্রতিটি মানুষ নিজের দৈবী পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন হোক, চৈতন্যস্বরূপরূপে নিজেকে উপলব্ধি করুক।

সিস্টার ক্রিস্টিন দেখিয়েছেন : সঙ্ঘ সম্বন্ধেও স্বামীজীর ধারণা এই সময়ের মধ্যেই নানা খুঁটিনাটি সহ গড়ে উঠেছিল। ''প্রথমে গঙ্গার তীরে একটা বড় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে একটা ঠাকুরঘর ও মঠ হবে তাঁর গুরুভাইদের থাকার জন্য এবং তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের ধ্যান ও ধর্মজীবন সংক্রান্ত সব বিষয় শেখানো হবে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে উপনিষদ, গীতা, সংস্কৃত ও বিজ্ঞানও থাকবে। তরুণ সাধুদের শিক্ষা যখন এইভাবে কয়েক বছর পূর্ণ হবে, তখন মঠের প্রধান যদি মনে করেন যে তাঁরা যথেষ্ট প্রস্তুত, তখন তাঁদের মঠের বাইরে অন্যত্র পাঠানো হবে—নতুন কেন্দ্র খুলতে, প্রচার করতে, রোগী ও দরিদ্রের সেবায় এবং দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময় ত্রাণকার্যে।''

এরপর সিস্টার ক্রিস্টিন সবিস্ময়ে লিখছেন : ''একজন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী এরকম একটা বিরাট কাজের পরিকল্পনা করছেন, এটা সেইসময় প্রায় পাগলামি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে আমরা দেখেছি যে, এই পরিকল্পনা প্রতিটি খুঁটিনাটি সহ কার্যে রূপায়িত হয়েছে।''[২১]

স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলকাতায় এলেন ১৮৯৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি। ৮ মার্চ তিনি বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং রওনা হন; সঙ্গে যান স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, গিরিশচন্দ্র, আলাসিঙ্গা ও গুডউইন সহ আরও কয়েকজন। দার্জিলিঙেই তিনি তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন, "I shall revolutionize the monastic order''[২২]—সন্ন্যাসিমণ্ডলীর প্রচলিত ধারায় আমি একটা বিপ্লব আনব। পরবর্তী কালে তুরীয়ানন্দজী বলতেন, ''Swamiji has given a new shape to the traditional order of Sannyasin, according to the need of the age''[২৩]—যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বামীজী সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত ধারাকে একটি নতুন রূপ দিয়েছেন। দার্জিলিং থেকে ফিরে ১৮৯৭-র ১ মে তারিখে বলরাম মন্দিরে গৃহী ও ত্যাগীদের এক মিলিত সভায় স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। নাম হয়—রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন। ৫ মে দ্বিতীয় সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী ঠিক করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য এই মিশনের স্থাপনা। দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য এই মিশন শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ দেবে। মানুষকে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যা শেখাবে এবং ওই বিদ্যা শেখাতে পারে—এরকম উপযুক্ত মানুষকে শিক্ষিত করবে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই মিশন 'বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে' যেভাবে রূপ পেয়েছে, সেভাবে সেগুলিকে জনসমাজে প্রচার করবে। সেইসঙ্গে লক্ষ রাখবে—জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যেন 'আত্মীয়তা' স্থাপিত হয়। কারণ এই মিশন বিশ্বাস করে জগতের 'যাবতীয় ধর্মমত' 'এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র।'[২৪]

মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে এটিও ছিল : ''মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেহেতু কেবল আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক, অতএব রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।''[২৫]

'রামকৃষ্ণ মঠ' আগেই ছিল—যদিও 'বরানগর মঠ', 'আলমবাজার মঠ' বা শুধু 'মঠ' বলেই সেটি

অভিহিত হত; এখন যোগ হল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। 'রামকৃষ্ণ মঠ' রেজিস্টার্ড হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এবং 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে রেজিস্টার্ড হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। এই উভয় মিলেই 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' একথা আমরা শুরুতেই বলে এসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণকে জগজ্জননী যে বলেছিলেন, 'উদারভাবে নবীন সম্প্রদায়' করতে হবে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ যুগ্ম সঙ্ঘই সেই সম্প্রদায়। স্বামীজী যদিও বলেছেন যে, 'সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয়নি', তবুও তিনিই আবার, এই মায়া-কবলিত সংসারের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার মায়িক প্রবণতার বিকল্প হিসেবেই যেন একটি non-sectarian sect বা 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের' কথা ভেবেছেন—যার মধ্যে সম্প্রদায়ের গুণগুলি থাকবে, কিন্তু দোষগুলি থাকবে না। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনই সেই 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়'। এতে ত্যাগ, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণগুলি আছে; কিন্তু গোঁড়ামি নেই, সংকীর্ণতা নেই। এই সম্প্রদায়ের মূল লক্ষণই হল 'যত মত তত পথ' বাণীতে আন্তরিক বিশ্বাস। তাই পোড়া দড়ি যেমন বাঁধতে পারে না, এই 'সম্প্রদায়'ও কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না।[২৬]

রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও গৃহীদের সম্মিলিত সংস্থা, কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ শুধুই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সঙ্ঘ। এবং যে-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য, তাঁরা রামকৃষ্ণ মঠের ব্রতধারী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী। তাই রামকৃষ্ণ মঠই এই যুগ্ম সংস্থার প্রাণ; মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক জীবনই এই যুগ্ম সংস্থার অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শক্তি। সঙ্ঘের প্রাণশক্তিস্বরূপ এই সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের জীবন কোন্ পথে চলে রামকৃষ্ণ-ভাবের সার্থক ধারক ও বাহক হয়ে উঠবে, যার ফলে চিরকাল অটুট শক্তিমান থাকবে এই যুগ্ম সঙ্ঘ—তার সুস্পষ্ট ও স্থায়ী দিগ্‌দর্শকরূপে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। এটি স্বামীজীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এই নিয়মাবলী সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের জীবনবেদ।

এই নিয়মাবলীর একেবারে শুরুতেই স্বামীজী স্পষ্টভাবে বলেছেন : পুরুষদের জন্য যেমন মঠ তৈরি হয়েছে, তেমনই একইভাবে নারীদের জন্যও মঠ তৈরি করতে হবে। শুধু পার্থক্য হবে এই যে, নারী-মঠ নারীরাই চালাবে, পুরুষদের সঙ্গে তার কোনও সংস্রব থাকবে না—ঠিক যেমন পুরুষদের মঠের পরিচালনায় নারীদের কোনও ভূমিকা নেই। প্রাথমিকভাবে নারী-মঠের পরিচালনায় পুরুষরা দূর থেকে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু সে শুধু যতদিন পর্যন্ত না উপযুক্ত নারী পরিচালক পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি ১৮৯৪-৯৫ সাল থেকেই স্বামীজী নারী-মঠের কথা ভাবছিলেন। সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, স্বামীজী মনে করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে যে-বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি জেগেছে, তার সুফল ও ব্যবহার শুধু পুরুষদের নয়, নারীদেরও প্রাপ্য। সেইজন্য স্বামীজী ভাবতেন—সিস্টার নিবেদিতা বলছেন—যে-সঙ্ঘের তিনি সন্ন্যাসী (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ) সেই সঙ্ঘের ভাগ্য চিরকালের জন্য জড়িত ভারতের নারী ও জনসাধারণের প্রয়োজনের সঙ্গে : ''Our Master, at any rate regarded the Order to which he belonged as one whose lot was cast for all time with the cause of women and the people.'' সেজন্যই স্বামীজী পুরুষদের মঠের জন্য স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করারও আগে 'মা আর মায়ের মেয়েদের' জন্য স্থায়ী জায়গা করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। নারীমঠের অস্ফুট আগমনী প্রথম বেজেছিল বলা যায়

১৮৯৫-এর নভেম্বর মাসের সেই কনকনে-শীত বিকেলেই—যেদিন লন্ডনে ইসাবেল মার্গেসনের বৈঠকখানায় নিবেদিতা প্রথম দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন স্বামীজীকে। তারপর নিবেদিতা স্কুল ও সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন, সিস্টার সুধীরা, পারুল (সরলা) প্রমুখের পর্যায়ক্রমে আত্মত্যাগের মাধ্যমে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সূচনা—যথাক্রমে ১৯৫৪ ও ১৯৬০ সালে।

স্বামীজী তাঁর নিয়মাবলীতে প্রথমেই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আদর্শকে—নিজের মুক্তি ও জগতের মঙ্গলপ্রয়াসকে—সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনব্রত বলেছেন। তাঁরা আত্মমুক্তির জন্য জপধ্যানাদি প্রচলিত সাধনভজন করেন, যেগুলিকে স্পষ্টই চেনা যায় ধর্মীয় সাধনা বলে। আর জগতের কল্যাণ করতে তাঁরা যেসব কাজ করেন—জগতের চোখে সেগুলি 'জগদ্ধিতায়' হলেও—তাঁরা সেগুলি করেন আত্মমুক্তির সাধনা হিসেবেই, শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ মেনে। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করছি। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দপুরী মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষাপ্রাপ্ত হলেও এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সাধুর ঘনিষ্ঠ হলেও, সন্ন্যাসীদের সেবাকাজ করাকে সমর্থন করতে পারতেন না। স্বামী প্রেমেশানন্দজী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর মতে সন্ন্যাসীদের কী কর্তব্য? তিনি জানান, শংকরপন্থী দশনামী সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্তব্য মহাবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। তখন প্রেমেশানন্দজী তাঁকে বলেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' যেমন মহাবাক্য, তেমন 'তত্ত্বমসি'ও একটি মহাবাক্য। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাবটি প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যেরই নিদিধ্যাসন, প্রতিমুহূর্তে জীববুদ্ধির উপর শিবভাবনার স্থাপন। চিদ্‌ঘনানন্দপুরীজী প্রেমেশানন্দজীর এই ব্যাখ্যা শুধু মেনেই নেননি, হাত দুটি তুলে 'বাঃ বাঃ' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।[২৭]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সন্ন্যাসী ও গৃহীর মিলিত সঙ্ঘ। যে-'নবীন সম্প্রদায়' গঠনের প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সাধনার শেষে লাভ করেছিলেন, তা গৃহী না সন্ন্যাসীর, পুরুষ না নারীর—তার কোনও উল্লেখ শ্রীরামকৃষ্ণ করেননি। মা তাঁকে 'অন্তরঙ্গ' বলে যাঁদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গৃহীরাও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর চরণপ্রান্তে নরেন-রাখাল প্রমুখ ত্যাগী পার্ষদেরা যেমন এসেছিলেন, তেমনই এসেছিলেন মাস্টারমশাই, বলরাম বসু, নাগমশাই প্রমুখ গৃহীও। শুরু থেকেই এই সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে ত্যাগীদের তপস্যায় এবং গৃহীদের ভক্তি-শ্রদ্ধাপূত নিঃস্বার্থ সহযোগিতায়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হয়। তাতে পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী (সেইসময় অধ্যক্ষ মহারাজ, উদ্বোধনী ভাষণ, ২৩ ডিসেম্বর), স্বামী ভূতেশানন্দজী (অন্যতম সহাধ্যক্ষ, সকালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ২৪ ডিসেম্বর) এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী (সাধারণ সম্পাদক, ওই অধিবেশনে 'keynote' বক্তৃতা)—তিনজনেই তাঁদের বক্তৃতায় বলেন, ব্যাপক অর্থে ত্যাগী এবং গৃহী উভয়কে নিয়েই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ গ্রন্থের পূর্বকাণ্ডের চতুর্দশ বল্লীতে দেখি, স্বামীজী স্বয়ং তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে 'তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি' নিয়ে 'নূতন মঠের জমিতে' অর্থাৎ বর্তমান বেলুড় মঠভূমিতে স্থাপন করতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে শিষ্যকে বলছেন : ''ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব—তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ওই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।'' বেলুড় মঠের জমিতে অস্থি-ভস্ম

সহ ওই কৌটো স্থাপন করে স্বামীজী সেদিন নিজে পুজো ও হোম করেছিলেন এবং স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করে ঠাকুরকে নিবেদন করেছিলেন। পূজিত কৌটো অবশ্য পূজাশেষে আবার নীলাম্বরবাবুর মঠবাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল—কারণ, নতুন জমিতে স্থায়ীভাবে মঠ স্থানান্তরিত করার সব প্রস্তুতি তখনও হয়নি। স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন : ''এই মঠ (অর্থাৎ বেলুড় মঠ) হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মতো ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ওই দক্ষিণের জমিটায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে।" শিষ্য স্বামীজীর কথাকে 'অদ্ভুত কল্পনা' বললে স্বামীজী বলেন, ''কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে।" স্বামীজীর এই স্বপ্ন প্রতীকী। ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর অনুসারী ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে বিরাজ করবে মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে এবং বিশ্বব্যাপী গৃহীরা তাঁদের অনুসরণ করে সংসারে থাকবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কালে মানুষের জীবনকে 'কামকাঞ্চনায়িত' রূপে গ্রহণ করার তত্ত্বাবলী পৃথিবীতে এসেছিল ফ্রয়েড ও মার্কসের সৌজন্যে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কামকাঞ্চন-নিরপেক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত হল যে-সঙ্ঘরূপ মহাশক্তি, তা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে জীবনের সর্বাঙ্গকে দিব্যায়িত করার তত্ত্ব, জীবনের তথাকথিত ঐহিক অংশকেও 'পারমার্থিক' করে তোলার মহান তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব কল্পনা বা মননপ্রসূত নয়, বহু পঠন-পাঠন বা ভূয়োদর্শন-প্রসূতও নয়। এই তত্ত্ব সত্যপ্রসূত—যে-সত্য আমাদের সনাতন শাস্ত্রে নিহিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামীজীর জীবনে মূর্ত। এই মহান তত্ত্ব অনুসরণ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্যাগী ও গৃহীরা তাদের দেবস্বরূপের দিকে এগিয়ে চলবে, প্রতিটি প্রজন্মে অনেকে উপলব্ধিও করবে তাদের দেবস্বরূপ। নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর ও উচ্চতম সত্যের দিকে নিরন্তর সশ্রদ্ধ এই যাত্রার ফলে প্রতিটি প্রজন্ম মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণে উন্নত হতে থাকবে। ক্রমশ, স্বামীজী 'নিয়মাবলী'তে যা বলেছেন তা বাস্তবায়িত হবে : ''মানবসন্তান যোগবিভূতিতে ভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে।" '' 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে।" অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি জন্মজন্মান্তরের সাধনা ও চতুষ্পার্শ্বের দিব্য পরিবেশের প্রভাবে এতই শুদ্ধ হয়ে যাবে যে, প্রত্যেকেই দেখবেন, 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।' তখন, স্বামীজী যেমন বলেছেন—''...prophets will walk through every street in every city in the world"[২৮] —বাস্তব হয়ে উঠবে। পৃথিবীর প্রতি নগরীর প্রতিটি রাস্তায় সিদ্ধ মহাপুরুষেরা ঘুরে বেড়াবেন, যেমন অ্যাডভোকেট-ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার-অধ্যাপকের সন্ধান পাওয়া যায় প্রতিটি শহরের প্রায় সর্বত্র।

মানবসভ্যতার সর্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিকীকরণ—total spiritualisation[২৯]—এই হল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রত ও লক্ষ্য, যা প্রধানত নির্ভর করছে এই সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের উপর। ✠

তথ্যসূত্র

১। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১ এপ্রিল ১৯২৬
২। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভাগ ২, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১০৩
৩। তদেব, পৃঃ ১০৪
৪। তদেব, ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ২১৬
৫। তদেব, ভাগ ২, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১০৪
৬। তদেব, পৃঃ ১০৫
৭। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১), পৃঃ ৩৬
৮। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, (উদ্বোধন কার্যালয়,

২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ১৯৮

৯। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৪ [এরপর, *যুগনায়ক*]

১০। Swami Bhuteshananda, *Uniqueness of the Ramakrishna Incarnation and other essays* (Advaita Ashrama : Kolkata, 2018), p. 52

১১। Sister Nivedita, *The Complete Works,* (Advaita Ashrama, 2006), Vol. 1, *The Master As I Saw Him*, p. 139

১২। *লীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ২, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৬৪

১৩। *যুগনায়ক*, খণ্ড ১, পৃঃ ২২১-২২

১৪। শংকরাচার্য গীতার উপোদ্‌ঘাতভাষ্যে 'স্বপ্রয়োজনাভাবে অপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া' কথাটি ব্যবহার করেছেন এটি বোঝাতে যে, নিজের কোনও প্রয়োজনের একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবান যে কখনও কখনও নরদেহ ধারণ করে আসেন, তা শুধু প্রাণীদের অনুগ্রহ করার ইচ্ছায়।

১৫। সম্পাদনা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা*, (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ২৬

১৬। তদেব, পৃঃ ৪১৭

১৭। দ্রঃ *Swami Vivekananda : A Hundred Years Since Chicago : A Commemorative Volume* (Publisher : Swami Lokeswarananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture : Kolkata, 1994), pp. 10-11

১৮। Swami Vivakananda, *My India : The India Eternal* (Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2019), p. 39

১৯। পত্রাবলীতে এই চিঠিটির তারিখ দেওয়া আছে ১৯ মার্চ ১৮৯৪। মেরি লুইস বার্ক New Discoveries Vol I, p. 186-এ দেখিয়েছেন, চিঠিটি জানুয়ারিতে লেখা; তারিখ ১৫ জানুয়ারির পর।

২০। By His Eastern and Western Disciples, *Life of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama, 2008), Vol 1, pp. 534-35 [এরপর, *Life*]

২১। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতি *'Reminiscences of Swami Vivekananda'* (Advaita Ashrama,1974) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২২। *Life*, Vol 2 (1995), p. 242

২৩। তদেব

২৪। দ্রঃ *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পৃঃ ৩৭

২৫। *যুগনায়ক*, খণ্ড ৩ (১৩৮৬), পৃঃ ১১-১২

২৬। দ্রঃ কিডিকে লেখা স্বামীজীর ৩ মার্চ ১৮৯৪ তারিখের পত্র।

২৭। পূজনীয় মুমুক্ষানন্দজীর সূত্রে লেখকের প্রাপ্ত পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীর একটি নোটবইয়ের ফোটোকপিতে রয়েছে : প্রেমেশানন্দজী মনে করতেন নিজ হৃদয়ে ইষ্টচিন্তা হল 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তত্ত্বের সাধনা এবং সর্বজীবে ইষ্টধারণা হল 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বের ধারণা।

২৮। *The Complete Works of Swami Vivekananda*, (Advaita Ashrama, 2011), Vol. 6, p. 10

২৯। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের একটি অংশের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী সাধু-ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''Our objective is to spiritualize the whole world—not to confine our work to Calcutta, Belur or India...the whole world has to be spiritualized.''
(সংকলন : সুজাতা সিংহ, *স্বামী গম্ভীরানন্দ : এক মহাজীবনের কথা*, স্বামী গম্ভীরানন্দ সেন্টিনারি কমিটি, ২০০৮), পৃঃ ১০২-০৩